নবী জীবনী

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

আয-যুলফি দা‘ওয়াহ সেন্টার

অনুবাদ: আয-যুলফি দা‘ওয়াহ সেন্টার

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

السيرة النبوية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

ترجمة: شعبة توعية الجاليات بالزلفي

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

IslamHouse.com

সূচীপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	নবী জীবনী	৪
২	ইবনুয্ যাবিহাঈন	৫
৩	হস্তী বাহিনীর ঘটনা	৭
৪	দুগ্ধ পান	৯
৫	বক্ষ বিদারণ	১২
৬	আমেনার মৃত্যু	১৩
৭	হাবশায় হিজরত	২৫
৮	উমারের ইসলাম গ্রহণ	২৭
৯	দুঃখের বছর	৩০
১০	তায়েফের পথে	৩১
১১	চন্দ্র দু টুকরা হওয়া	৩২
১২	মি'রাজ	৩৩
১৩	মদীনায় হিজরত	৩৭
১৪	মসজিদে নববীর নির্মাণ	৪২
১৫	বদর যুদ্ধ	৪৩
১৬	ওহুদ যুদ্ধ	৪৬

১৭	খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ	৪৬
১৮	মক্কা বিজয়	৪৭
১৯	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু	৪৯
২০	তাঁর চরিত্র	৫০
২১	তাঁর কতিপয় মু'জিযা	৫৪

নবী জীবনী

মুর্তি পূজাই ছিল আরব দেশে প্রচলিত ধর্ম। সত্য ধর্মের পরিপন্থী এ ধরণের মূর্তিপূজাবাদ অবলম্বন করার কারণে তাদের এ যুগকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত তথা মুর্খতার যুগ বলা হয়। লাত, উযযা, মানাত ও হুবল ছিল তাদের প্রসিদ্ধ উপাস্যগুলোর অন্যতম। আরবের কিছু লোক ইয়াহূদী বা খৃষ্টান ধর্ম বা অগ্নি পুজকদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আবার স্বল্প সংখ্যক লোক ছিল যারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রদর্শিত পথে ছিল অবিচল, আঁকড়ে ধরেছিল তার আদর্শ। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেদুঈনরা সম্পূর্ণভাবে পশু সম্পদের ওপর নির্ভর করত। আর নগরবাসীদের নিকট অর্থনৈতিক জীবনেরও ভিত্তি ছিল কৃষি কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে মক্কাই ছিল বৃহত্তর বাণিজ্য নগরী। অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়ন ও নাগরিক সভ্যতা ছিল। সামাজিক দিক দিয়ে যুলুম সর্বত্র বিরাজমান ছিল, সেখানে দুর্বলের ছিল না কোনো অধিকার। কন্যা সন্তানকে জীবদ্দশায় দাফন করা হতো। মান-ইজ্জত ও সম্মানকে করা হতো

পদদলিত। সবল দুর্বলের অধিকার হরণ করতো। বহুবিবাহ প্রথার কোনো সীমা ছিল না। ব্যভিচার অবাধে চলতো। নগন্য ও তুচ্ছ কারণে যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে-ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি এ ধরণের ভয়াবহই ছিল।

ইবনুয্ যাবিহাঈন

রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে কুরাইশরা ছেলে-সন্তান ও সম্পদের গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করতো। তাই তিনি মানত করলেন যে, আল্লাহ যদি তাকে দশজন ছেলে দান করেন তাহলে তিনি এক জনকে কথিত ইলাহের নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে যবেহ করবেন। তাঁর সাধ বাস্তব রূপ পেল। দশ জন ছেলে জুটলো তাঁর ভাগ্যে। তাদের একজন ছিলেন নবীর পিতা আব্দুল্লাহ। আব্দুল মুত্তালিব মানব পুরন করতে চাইলে লোকজন তাকে বাধা দেয়, যাতে এটা মানুষের মধ্যে প্রথা না হয়ে যায়। অতঃপর সবাই আব্দুল্লাহ এবং দশটি উটের মধ্যে লটারীর

তীর নিক্ষেপ করতে সম্মত হয়। যদি লটারীতে আব্দুল্লাহ নাম আসে তাহলে প্রতিবার ১০টি করে উট সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হবে। লটারী বারংবার আব্দুল্লাহর নামে আসতে থাকে। দশমবারে লটারী উটের নামে আসে যখন তার সংখ্যা ১০০ তে দাঁড়ায়। ফলে তারা উট যবেহ করল এবং রক্ষা পেল আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল মুত্তালিবের সব চাইতে প্রিয় ছেলে ছিল। আব্দুল্লাহ তরুণ্যের সীমায় পা রাখলে তাঁর পিতা বনী যোহরা গোত্রের আমেনা বিনতে ওয়াহাব নামক এক তরুণীর সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিয়ের পর আমেনা অন্তঃসত্বা হবার তিন মাস পর আব্দুল্লাহ এক বানিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হয়। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রোগাক্রান্ত হয়ে মদিনায় বনী নাজ্জার গোত্রে তাঁর মামাদের কাছে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাকে সমাধিস্থ করা হয় সেখানে। এদিকে গর্ভের মাসগুলো পুরো হয়ে প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসলো। আমেনা অবশেষে সন্তান প্রসব করলেন। আর এ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় ৫৭১

ইং এর ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ভোরবেলায়। উল্লেখ্য যে সে বছরেই হস্তী বাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা

হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো:

আবরাহা ছিল ইথিওপিয়ার শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের গভর্নর। সে আরবদেরকে কাবা শরিফে হজ্জ করতে দেখে সান‘আতে (বর্তমানে ইয়ামানের রাজধানী) এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো যেন আরবরা এ নব নির্মিত গির্জায় হজ্জ করে। কেননা গোত্রের এক লোক (আরবের একটা গোত্র) তা শুনার পর রাতে প্রবেশ করে, গির্জার দেওয়ালগুলোকে পায়খানা ও মলদ্বারা পঙ্কিল করে দেয়। আবরাহা এ কথা শুনার পর রাগে ক্ষেপে উঠলো। ৬০ হাজারের এক বিরাট সেনা বাহিনী নিয়ে কাবা শরিফ ধ্বংস করার জন্য রওয়ানা হলো। নিজের জন্য সে সব চেয়ে বড় হাতিটা পছন্দ করলো। সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়টি হাতি ছিল। মক্কার নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত তারা

যাত্রা অব্যাহত রাখলো। তাঁর পর সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে মক্কা প্রবেশ করায় উদ্যত হলো কিন্তু হাতি বসে গেল, কোনোক্রমেই কাবার দিকে অগ্রসর করানো গেলনা। যখন তারা হাতিকে কাবার বিপরীত দিকে অগ্রসর করাতো দ্রুত সে দিকে অগ্রসর হতো কিন্তু কাবার দিকে অগ্রসর করাতে চাইলে বসে পড়তো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি যা তাদের ওপর পাথরের টুকরা নিক্ষেপকরা শুরু করে দিয়েছিল। অতঃপর তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক পাখি তিনটি করে পাথর বহন করছিল। ১টি পাথর ঠোঁটে আর দু'টি পায়ে। পাথর দেহে পড়ামাত্র দেহের সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। যারা পলায়ন করে তারাও পথে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা পায় নি।

আবরাহা এমনি একটি রোগে আক্রান্ত হয় যার ফলে তার সব আঙ্গুল পড়ে যায় এবং সে সান'আয় পাখির ছানার মতো পৌঁছলো এবং সেখানে মৃত্যু হলো। কুরাইশরা গিরিপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর ভয়ে

পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল। আবরাহার সেনাবাহিনীর এ অশুভ পরিণামের পর তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

দুগ্ধ পান

আরবদের প্রথা ছিল যে তারা তাদের শিশুদেরকে বেদুঈন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে লালন-পালন করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিত। সেখানে তাদের দৈহিক সুস্থতার অনুকুল পরিবেশ ছিল। রাসূলের পবিত্র জন্ম লাভের পর বনী সা‘দ গোত্রের কিছু বেদুঈন লোক মক্কায় আসে। তাদের মহিলারা মক্কার ঘরে ঘরে শিশুর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাসূলের পিতৃহীনতা ও দারিদ্রের কারণে কেউ তাকে নেয় নি। হালিমা সা‘দিয়াও ছিল তাদের একজন। সবার মতো সেও ছিল বিমুখ। শিশু পালনের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবনের অভাব অনটন বিমোচন করার লক্ষ্যে মক্কার অধিকাংশ ঘরে শিশুর অনুসন্ধান করেও সফল হয়নি সে। অধিকন্তু সে বছর ছিল অনাবৃষ্টি ও খরা। তাই স্বল্প

পরিশ্রমিকে এতিম সন্তানকে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমেনার ঘরে আবার ফিরে আসে সে। হালিমা আপন স্বামীর সাথে মক্কায় মন্থর গতিতে চলে এমন একটি দুর্বল গাধিনী নিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলকে কুলে নেয়ার পর গাধিনী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল এবং অন্যান্য সব জানোয়ারকে পিছনে ফেলে আসছিল। ফলে সফর সঙ্গীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়। হালিমা আরো বর্ণনা করেন যে, তার স্তনে কোনো দুধ ছিল না, তার ছেলে ক্ষুধায় সর্বদা কাঁদতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখ স্তনে রাখার পর প্রচুর পরিমাণে দুধ তাঁর স্তনে আসতে লাগলো। বনী সা'দ গোত্রের অধ্যুষিত অঞ্চলের অনাবৃষ্টি সম্পর্কে বলে যে, এ শিশু (মহাম্মাদ) দুধ পান করার বদৌলতে জামিতে উৎপন্ন হতে লাগলো ফল মুল এবং ছাগল ও অন্যান্য পশু দিতে লাগলো বাচ্চা। অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের পরিবর্তে সুখ ও সমৃদ্ধি সর্বত্র বিরাজমান। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালিমার পরিচর্যায় দু'বছর পালিত হয়।

হালিমা তাঁকে দারুণভাবে চাইতো। হালিমা নিজেই হৃদয়ের গভীরে এ শিশুকে ঘিরে রাখা অস্বাভাবিক কিছু জিনিস পুরো অনুভব করতো। দু' বছর শেষ হবার পর হালিমা তাকে মক্কায় মাতা ও দাদার কাছে নিয়ে আসলো। কিন্তু হালিমা রাসূলের বরকত অবলোকন করে যে, বরকত তাঁর অবস্থায় পরিবর্তন ঘটায় আমেনার কাছে রাসূলকে দ্বিতীয় বার দেওয়ার জন্য আবেদন করলো। আমেনা তাতে সম্মত হয়। হালিমা এতিম শিশুকে নিয়ে নিজ এলাকায় আনন্দ ও সন্তোষ সহকারে ফিরে আসে।

বক্ষ বিদারণ

এক দিন শিশু মুহাম্মাদ হালিমার ছেলেরে সাথে তাবু থেকে দূরে খেলা-ধুলা করছিল। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছরের কাছাকাছি, এমতাবস্থায় হালিমার ছেলে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে এসে তাকে কুরাইশী ভায়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানালো। ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দেয় যে, দু'জন সাদা পোষাক পরিহিত লোককে আমাদের কাছ

থেকে মুহাম্মাদকে নিয়ে মাটিতে চিৎ করে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি। তার বর্ণনা শেষ না করতেই হালিমা ঘটনা স্থলের দিকে দৌড়ে যান। গিয়ে দেখেন মুহাম্মাদ নিজ স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডল হলুদ বর্ণ, দেহ ফ্যাকাশে। তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত শান্ত ভাবে জবাব দেন যে, তিনি ভালো আছেন। তিনি আরো বলেন: সাদা পোষাক পরিহিত দু'ব্যিক্তি এসে তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করে হৃদয় বের করে কালো জমাট বাধা রক্ত বের করে ফেলে দেয় এবং হৃদয়কে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। বক্ষ মুছিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। হালিমা বক্ষের সে স্থানটি স্থির করার চেষ্টা করেও কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেন না। এরপর মুহাম্মাদকে নিয়ে তাবুতে ফিরে আসেন। পরের দিন ভোর হতেই হালিমা মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের কাছে মক্কায় নিয়ে আসে। আমেনা অনির্ধারিত সময়ে হালিমাকে ছেলে নিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হন, অথচ তিনি ছেলেকে অন্তর থেকে

দেখতে চাচ্ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হালিমা বক্ষ বিদারণের ঘটনার পুরো বিবরণ দেন।

আমেনার মৃত্যু

আমেনা নিজের এতিম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে ইয়াসরাবে বনী নাজ্জার গোত্রে মামাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করে। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে মারা যান এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

ফলে মুহাম্মাদ চার বছর বয়সে মাতৃ-স্নেহ ও আদরের ছায়া থেকে বঞ্চিত হন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এ অপূরণীয় ক্ষতির কিছু লাঘব করতে হবে। তাই তিনি তাঁর দেখা-শুনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছয় বছর বয়সে পা রাখেন তখন তাঁর দাদা ইহকাল ত্যাগ করেন। অতঃপর চাচা আবু তালিব আর্থিক অভাব-অনটন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও তাঁর দেখা-শুনার দায়িত্ব নেন। রাসূলের চাচা আবূ তালেব ও তাঁর স্ত্রী রাসূলের সাথে

আপন ছেলের ন্যায় আচরণ করেন। এতিম ছেলের সম্পর্কে আপন চাচার সাথে অনকটা গভীর হয়ে যায়। এ পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেন। সততা ও সত্যবাদিতার মত গুণে গুণান্বিত হয়ে যৌবন কাল অতিবাহিত করেন। এমন কি কেউ যদি বলে আল-আমিন উপস্থিত হয়েছেন বুঝা হতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন। রাসূল যখন কিছুটা বড় হয়ে যৌবনে পদার্পন করেন, তখন স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবিকার্জনের চেষ্টা শুরু করেন। শ্রম ব্যয় ও উপার্জনের পালা আরম্ভ হলো। তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরাইশের কিছু লোকের ছাগলের রাখাল হিসেবে কাজ করেন। খাদিজা বিনতে খোয়াইলিদ কর্তৃক আয়োজিত এক বানিজ্যিক ভ্রমনে সিরিয়া গমন করেন। খাদিজা ছিলেন বিত্তশালীনী মহিলা। সে ভ্রমণে সম্পদ ও ব্যবসায়িক সামগ্রির তত্বাবধায়ক ছিল তাঁরই দাস "মাইসারাহ"। রাসূলের বরকত ও সততার কারণে খাদিজার এ ব্যবসায়ে নজীরবিহীন লাভ হয়। তিনি স্বীয় দাস মাইসারাহর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে বল হয়

মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ নিজেই বেচা-কেনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ক্রেতার ঢল নামে। ফলে কোনো যুলম করা ব্যতিরেকেই আয় হয় প্রচুর। খাদিজা তাঁর দাসের বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এমনিতেও তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি মুহাম্মদের প্রতি হয়ে পড়েন মুগ্ধ ও অভিভূত। ইতোপূর্বে তিনি একবার বিয়ে করেছিলেন। স্বামী মারা যাওয়ার পরে বিধবাই রইলেন। এখন পুনরায় তাঁর মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহর সাথে নতুন অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করার তীব্র আকাঙ্খা জাগে। তাই এ ব্যাপারে মুহাম্মদের মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে নিজের এক আত্মীয়কে পাঠান। রাসূলের নিকট খাদীজার আত্মীয় বিয়ের প্রস্তাব রাখলে তিনি তা গ্রহণ করেন। বিয়ে সম্পাদিত হলো। একে অপরের দ্বারা সুখী হন। তিনি খাদিজার অর্থ সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচারনায় যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। খাদিজার ঔরসে জন্ম লাভ করেন যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা

এবং কাসিম ও আব্দুল্লাহ নামক দু’ছেলে যারা শৈশবেই মারা যান।

তাঁর বয়স চল্লিশের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে মক্কার আদূরে অবস্থিত হেরা নামক এক গুহায় তিনি নিরিবিলি ও নির্জন অবস্থায় কয়েক দিন করে কাটিয়ে দিতেন। পবিত্র রমযানের ২১ তারিখের রাতে হেরা গুহায় তাঁর কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০। জিবরীল বলেন, পড়ুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরীল দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বারের মত পুনরায় বললেন। তৃতীয়বার জিবরীল বলেন,

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥﴾ [العلق:1-5]

“পাঠ করুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে

শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। [সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১-৫] অতঃপর জিবরীল আলাইহিস সালাম চলে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর হেরা গুহায় অবস্থান করতে পারলেন না। তিনি ঘরে এসে খাদিজাকে হৃদয় স্পন্দিত অবস্থায় বললেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে. আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। ভীত ও আতংক দূর হয়ে গেলে তিনি সব কিছু খাদিজাকে খুলে বললেন। এরপর তিনি বললেন-আমি নিজের ব্যাপারে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয় স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখেন, গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। অতিথিকে সমাদর করেন। এবং বিপদগ্রস্থদের সহায়তা করেন”। কিছু দিন পরে তিনি আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখার জন্য আবার হেরা গুহায় ফিরে আসেন। রমযানের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটান। রমযান শেষে হেরা গুহা থেকে অবতরণ করে

মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। উপত্যকায় পৌঁছালে জিবরীলকে আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥﴾ [المدثر: ١، ٥]

“হে চাদরাবৃত্ত! উঠুন, সর্তক করুন, আপনার পালন কর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। আপনার পোষাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা দূর করুন।” [সূরা মুদ্দাস্‌সির, আয়াত: ১-৫]

পরবর্তী সময়ে ওহী অব্যাহত থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র দাওয়াতী ব্রত শুরু করলে সর্ব প্রথম তাঁর গুণাবর্তী স্ত্রী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঈমানের ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর স্বামীর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেন। তাই তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলিম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা আবু তালিবের স্নেহে, পরিচর্যা ও অবদানের

কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, যে রাসূলের মাতা ও দাদার পর দেখা-শুনার দায়িত্ব বহন করেন, তাঁর ছেলে আলির লালন-পালন ও দেখা-শুনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ সুন্দর পরিবেশে আলির অন্তর ও বিবেক খুলে। তিনিও ঈমান গ্রহণ করেন। অতঃপর খাদিজার দাস যাইদ ইবন হারেসা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হন। অতঃপর রাসূল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবু বাকারের সাথে ইসলামের ব্যাপারে আলাপ করলে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সত্যতার সাক্ষ্য দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনভাবে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। আর গোপন বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে গোপনীয় স্থান যেখানে তাঁর সাহাবী, শিষ্য ও আরোঅনেক লোক সমবেত হতেন তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করতেন। এ ভাবে অনেক লোক ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু সবাই ইসলামকে গোপনে রাখতেন। কারো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেলে কুরাইশের কাফেরদের

কঠিন নির্যাতনের শিকার হতেন। এ সময়ে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করা হতো।

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাওয়াতের গোপন ব্রতে ব্রস্ত থাকেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দেন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না। (হিজর: ৯৪) এ আদেশ পেয়ে এক দিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহন করে কুরাইশদেরকে ডাক দেন। তাঁর ডাক শুনে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। তন্মধ্যে তাঁর চাচা আবূ লাহাবও এক জন ছিল। সে কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সব চাইতে কট্টর শত্রু ছিল। মানুষ সমবেত হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি আপনাদেরকে একথার সংবাদ দিই যে পাহাড়ের পেছনে এক শত্রুদল আপনাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সবাই এক স্বরে বললো আমরা আপনার মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। তিনি

বললেন, আমি আপনাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন এবং মূর্তিপূজা বর্জন করতে বললেন। একথা শুনে আবু লাহাব রাগে ক্ষেপে উঠে বলে, তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।

﴿تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ١ مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢ سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ ٣ وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ٤ فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۢ ٥﴾ [المسد: ١، ٥]

“আবূ লাহাবের হস্তদয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোনো কাজে আসেনি তাঁর ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তাঁর স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে। তাঁর গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।” [সূরা লাহাব, আয়াত: ১-৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতী কাজ পুরো দমে অব্যাহত রাখলেন। জন সমাবেশ স্থলে তিনি প্রকাশ্য ভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। তিনি কা‘বা শরীফের নিকটে সালাত আদায় করতেন। মুসলিমদের ওপরে কাফিরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেলো। ইয়াসের, সুমাইয়্যা ও তাদের সন্তান আম্মারের বেলায় তাই ঘটেছে। আল্লাহদ্রোহীদের নির্যাতনে পিতা-মাতা শহীদ হন। নির্যাতনের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিলাল ইবন রাবাহ আবুজেহেলের ও উমাইয়্যা ইবন খালাফের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ খবর শুনে তাঁর মালিক অত্যাচারের সব পন্থা অবলম্বন করে, যাতে বিলাল ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু তিনি আকঁড়ে ধরেন ইসলামকে এবং অস্বীকার করেন ইসলাম ত্যাগ করতে। উমাইয়্যা তাঁকে শিকলাবদ্ধ করে মক্কার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুকের উপর বিরাট পাথর রেখে উত্তপ্ত বালিতে হেঁচড়িয়ে টানতো। অতঃপর সে ও তাঁর সঙ্গীরা বেত্রাঘাত করতো

আর বিলাল শুধু আহাদ, আহাদ, এক, এক, বলতে থাকতেন। এহেন অবস্থায় একবার আবূ বকর তাকে দেখেন। তিনি বিলালকে উমাইয়্যার কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়ে আল্লাহর নিমিত্তে স্বাধীন করে দেন। এ সব পৈশাচিক ও বর্বর অত্যাচারের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তাদের সাথে মিলিত হতেন অত্যন্ত সংগোপনে। কেননা প্রকাশ্যভাবে মিলিত হলে মুশরিকরা রাসূলের শিক্ষা প্রদানের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করবে কখনো দুদলের সংঘর্ষের আশংকাও ছিল। এ কথা সুবিদিত যে এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ মুসলিমদের ধ্বংস ও সমূলে বিনাশই ডেকে আনবে। কারণ মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি সামর্থ্য ছিল খুবই স্বল্প। তাই তাদের ইসলাম গোপন রাখাটাই ছিল দূরদর্শিতা। অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের অত্যাচার সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত ও ইবাদতের কাজ করতেন।

হাবশায় হিজরত

যার ইসলামের কথা ফাঁস হয়ে যেত তিনি মুশরিকদের নিপীড়নের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। বিশেষত দুর্বল মুসলিমরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহাবীদেরকে দীন নিয়ে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার নির্দেশ দেন। তিনি সেখানকার শাসক নাজাসীর নিকট নিরাপত্তা পাওয়ার আশ্বাস দেন। অনেক মুসলিম নিজের জান ও পরিবার বর্গের ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতো। তাই নবুওয়াতের ৫ম বছরে প্রায় ৭০ জন মুসলিম সপরিবারে হিজরত করেন। তাঁদের মধ্যে উসমান ইবন আফফান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। এ দিকে কুরাইশরা ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অবস্থান ব্যাহত করার চেষ্টা করে। সে দেশের রাজার জন্য পাঠায় উৎকোচ। পলায়নকারীদের (মুহাজির) বহিস্কারের অনুরোধ জানায়। তারা আরো বলে যে, মুসলিমরা ঈসা আলাইহিস সালাম ও মরিয়াম সম্পর্কে অপমানকর ও অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে। নাজাসী তাদেরকে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করলে তারা সত্যটি সুস্পষ্টভাবে বলে দেন, শাসক মুসলিমদের আশ্রয় দেন এবং বহিস্কার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এ বছরের রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম শরীফে যান। সেখানে ছিল কুরাইশের এক দল লোক। তিনি দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে তাদের সামনে সুরায়ে নাজম তিলাওয়াত করতে লাগলেন। এ সব কাফেররা ইতোপূর্বে কখনো আল্লাহর বাণী শুনে নি। কেননা তারা রাসূলের কিছুই না শুনার পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলো। আকস্মাৎ তেলাওয়াতের মধুর ধ্বনি তাদের কর্ণে গেলে তারা আল্লাহর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক বাণী ও সাবলীল ভাষা একাগ্রচিত্তে শুনে। অন্তরে তা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। এক পর্যায়ে রাসূল ﴿ فَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِۤ وَٱعۡبُدُواْ ۩ ٦٢ ﴾ [النجم:62] আয়াতটি পড়ে সাজদায় চলে যান। উপস্থিত ব্যাক্তিদের মধ্যে কেউ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তাঁরাও সেজদায় চলে যায়। অনুপস্থিত মুশরিকরা তাদেরকে তিরস্কার করে, ভর্ৎসনা করে। অন্য কোনো উপায় না দেখে এরা রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যে, তিনি

তাদের মূর্তির প্রশংসা করেন এবং বলেন, “তাদের (মুর্তিসমূহের) সুপারিশের আশা করা যায়” সাজদাহ করার অজুহাতস্বরূপ এ ভিত্তিহীন, নিরেট মিথ্যার বেসাতী করে তারা।

উমারের ইসলাম গ্রহণ

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ মুসলিমদের জন্য বড় বিজয় ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফারুক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তার মাধ্যমে সত্য ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন। ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরে ওমার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সত্যের ওপরে নই? তদুত্তরে তিনি বললেন কেন নয়, নিশ্চয় আমরা সত্যের মধ্যে। উমার বললেন: তাহলে এত গোপনীয়তা কী জন্যে। তখন আরকামের বাড়ীতে সমাবেত মুসলিমদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে দুদলে বিভক্ত করে দেন। হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে একদল

এবং উমার ইবনুল খাত্তাবের নেতৃত্বে আর একদলের নব সঞ্চারিত শক্তির ঈঙ্গিত দেওয়ার জন্যে মক্কার বিভিন্ন অলি-গলি প্রদক্ষিণ করে। কুরাইশরা দাওয়াত দমন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। শাস্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন, প্রলোভন ও হুমকি প্রদর্শনের মতো সর্ব প্রকার পন্থা গ্রহণ করে। কিন্তু এসব কুপরিকল্পিত ব্যবস্থাসমূহ মুসলিমদের ঈমান বৃদ্ধি ও দীন ইসলামকে অধিকতর আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোনো ভুমিকা রাখতে পারেনি।

এক নতুন দুরভিসন্ধি ও মন্দ অভিপ্রায় তাদের অন্তরে জন্ম নিল। আর তা হচ্ছে মুসলিম ও বনী হাশেমকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও একঘরে করে রাখার এক চুক্তিনামা লিখে, যাতে সবাই সাক্ষর করবে, কাবা শরিফের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেবে। চুক্তি অনুসারে তাদের সাথে বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদি, সাহায্য-সহযোগিতা, ও লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এ চুক্তির ফলে মুসলিমরা বাধ্য হয়ে মক্কার শি‘আবে আবি তালেব নামক এক উপত্যাকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তারা অবর্ণনীয় ক্লেশ ও দুঃখের শিকার হন সেখানে। ক্ষুধা ও অর্ধাহারের বিষাক্ত ছোবল থেকে

কেউ রক্ষা পায় নি। স্বচ্ছল ও সামর্থবান ব্যক্তিরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেন। খাদীজা তাঁর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করেন। বিভিন্ন রোগ ছাড়িয়ে পড়লো। অধিকাংশ লোকই মৃত্যুর প্রায়-দ্বার প্রান্তে এসে দাড়ালেন। কিন্তু তারা ধৈর্য অবিচলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে একজনও পশ্চাদপদ হননি। অবরোধ একাধারে তিন বছর স্থায়ী রইল। অতঃপর বনী হাশেমের সাথে আত্মীয়তা আছে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জনসমাবেশে চুক্তি ভঙ্গ করার কথা ঘোষণা করে। চুক্তির কাগজ বের করা হলে দেখা যায় যে সেটা খেয়ে ফেলা হয়েছে। শুধুমাত্র কাগজের এক কোণ যেখানে “বিসমিকা আল্লাহুম্মা” লেখা ছিল সেটাই অক্ষত রয়েছে। সংকটের অবসান হল। আর মুসলিম ও বনী হাশেম মক্কায় তাদের আবাসে ফিরে আসেন। কিন্তু কুরাইশরা মুসলিমদের দমন ও মুকাবিলায় সেই রকম রুঢ়তা ও কঠোরতা ক্ষনিকের তরেও পরিহার করেনি।

দুঃখের বছর

কঠিন রোগ ব্যধি আবু তালেবের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তগুলো গুণতে লাগলেন। মুমূর্ষাবস্থায় যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার পার্শ্বে বসে তাকে কালেমায়ে তাওহীদ (لا إله إلا الله) পড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আবু জাহলসহ অসৎ সঙ্গীরা যারা তাঁর পার্শ্বে ছিল তাকে বললো-শেষমূহুর্তে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করো না। মুসলিম হওয়া ব্যতিরেকে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূলের দুঃখ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবু তালেবের মৃত্যুর দু'মাস পরে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত হন। তাদের মৃত্যুর পরে কুরাইশের ঔদ্ধত্য ও উপদ্রব আরো বেড়ে যায়।

তায়েফের পথে

কুরাইশের ধৃষ্ঠতা এবং মুসলিমদের প্রতি তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের নীতি অব্যাহত থাকার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সংশোধন ও ইসলাম গ্রহণ থেকে অনেকটা হতাশ হয়ে তায়েফ গমনের সিদ্ধান্ত নেন। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। তায়েফ গমন সহজ ব্যপার ছিল না। আকাশ চুম্বি উচুঁ উচুঁ পাহাড়ের কারণে পথ ছিল দুর্গম। কিন্তু আল্লাহর পথে প্রত্যেক দুরূহ বস্তু সহজ হয়ে পড়ে। তায়েফবাসীরা রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সর্বাপেক্ষা মন্দ আচরণ করে। তারা শিশু কিশোরদেরকে লেলিয়ে দেয়। প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাঁর গোড়ালী করে রক্তে রঞ্জিত। তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফিরিশতাসহ এসে বলেন, আল্লাহ পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফিরিশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। ফিরিশতা আরজ করলো, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি চান

আমি তাদের ওপর আখসাবাইন (মক্কাকে ঘিরে রাখা পাহাড়) চেপে দিবো। তিনি বললেন, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা শুধু মাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো শরিক স্থাপন করবে না।

চন্দ্র দু' টুকরা হওয়া

মুশরিকরা অনেক সময় রাসূলকে অপারগ, অক্ষম সাব্যস্ত করার ফন্দিতে বিভিন্ন অলৌকিক নির্দশন দেখানোর দাবী করতো। আর এ ধরণের দাবী জানায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দো'আ করলে তাদেরকে চন্দ্র দু' টুকরো করে দেখানো হয়। কুরাইশরা এ নিদর্শন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান গ্রহণ করে নি। বরং তারা বলে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে জাদু করেছে তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, আমাদের জাদু করলেও সব মানুষকেও তো আর জাদু করতে পারবে না। দূতের অপেক্ষা কর। বিভিন্ন দূত আসলে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তারা বলে হ্যাঁ আমরাও

দেখেছি। কিন্তু কুরাইশরা নিজেদের কুফরে জেদ ধরে রয়ে গেলো। চন্দ্র দু’ টুকরা হওয়া এক বৃহত্তর অলৌকিক ঘটনার পটভূমি ও অবতরনিকা ছিলো। আর তা হলো মি‘রাজের ঘটনা।

মি‘রাজ

তায়েফ থেকে ফিরে আসা, তাদের রুঢ় ও অমানবিক আচরণ এবং আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যুর পর কুরাইশের অত্যাচার বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে একাধিক চিন্তা একত্রিত হয়। মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে শোকাহত ও দুঃখে কাতর নবীর সান্ত্বনা আসে। নবুওয়াতের ১০ম সালে রজবের ২৭ তারিখের রাতে তিনি যখন হারামে অবস্থান করছিলেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম বুরাক নিয়ে আসেন। বোরাক ঘোড়া সদৃশ এক জন্তু যার দু’টি দ্রুতমান পাখা আছে বিদ্যুতের ন্যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাতে আরোহণ করানো হয় এবং জিবরীল তাকে ফিলিস্তীনে বাইতুল

মুকাদ্দাসে প্রথমে নিয়ে যান। অতঃপর সেখান থেকে আসামান পর্যন্ত নিয়ে যান। এ ভ্রমনে তিনি পালনকর্তার বড় বড় নিদর্শন পরিদর্শন করেন। আসমানেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। তিনি একই রাত্রে তুষ্ট মন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন। ভোর বেলায় কাবা শরিফে গিয়ে তিনি লোকদেরকে একথা শুনালে কাফেরদের মিথ্যার অভিযোগ ও ঠাট্রা বিদ্রূপ আরোপ বেড়ে যায়। উপস্থিত কয়েক জন লোক তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ দিতে বলে। মূলত উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে অপারগ ও অক্ষম প্রমাণিত করা। তিনি তন্ন তন্ন করে সব কিছু বলতে লাগলেন। কাফেররা এতে ক্ষান্ত না হয়ে বলে, আমরা আর একটি প্রমাণ চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি পথে মক্কাগামী একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পাই এবং তিনি কাফেলার বিস্তারিত বিবরণসহ উটের সংখ্যা ও আগমনের সময়ও বলে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন কিন্তু কাফেররা হটকারিতা, কুফুর ও সত্যকে অস্বীকার করার দরুণ ভ্রান্ত রয়ে গেল।

সকাল বেলায় জিবরীল এসে রাসূলকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পদ্ধতি ও সময়সূচী শিখিয়ে দিলেন। ইতোপূর্বে সালাত শুধু সকাল বেলায় দু'রাকাত ও বিকেল বলায় দু'রাকাত ছিলো। কুরাইশরা সত্য অস্বীকার করতে থাকায় এ দিনগুলোতে তিনি মক্কায় আগমণকারী ব্যক্তিদের মাঝে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে লাগলেন। তিনি তাদের অবস্থান স্থলে মিলিত হয়ে দাওয়াত পেশ করতেন এবং তাঁর সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। আবু লাহাব তাঁর পিছনে তো লেগেই থাকতো। সে লোকদেরকে তাঁর থেকে ও তাঁর দাওয়াত থেকে সতর্ক থাকতে বলতো। একবার ইয়াসরিব থেকে আগত এক দলকে ইসলামের আহবান জানালে তারা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইয়াসরিববাসী ইয়াহূদীদের কাছে শুনতো যে অদূর ভবিষ্যতে একনবী প্রেরিত হবেন। তাঁর আবির্ভাবের যুগ নিকটে এসে গেছে। তাদেরকে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন, তারা বুঝতে পারলো যে তিনি সেই নবী যার কথা ইয়াহূদীরা বলেছে। তারা সত্বর ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে এবং বলে

ইয়াহূদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হয়। তারা ছিল ৬ জন, পরবর্তী বছর ১২ জন আসে। তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌলিক শিক্ষা দেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের সাথে তিনি মুস‘আব ইবন উমাইরকে কুরআন ও দীনের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠান। মুস‘আব মদিনায় বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এক বছর পর তিনি যখন মদিনায় আসেন, তখন তাঁর সাথে ৭২ জন পুরুষ ও দু’জন মহিলা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হন এবং তারা দীনের সহযোগিতা ও এর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর তারা মদিনায় ফিরে যান।

মদীনায় হিজরত

মদিনা সত্য ও সত্যের ধারকদের আশ্রয়ে পরিণত হয়। মুসলিমরা সে দিকে হিজরত করতে লাগলেন। তবে কুরাইশরা ছিল মুসলিমদেরকে হিজরত করতে বাধা দেওয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য বদ্ধ পরিকর। পরে

কতিপয় মুহাজির বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার হন। কুরাইশদের ভয়ে মুসলিমরা গোপনে হিজরত করতেন কিন্তু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হিজরত ছিল ব্যতিক্রম। তাঁর হিজরত ছিলো সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও চ্যালেঞ্জের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তরবারী উম্মোচিত করে এবং তীর বের করে কা'বায় গিয়ে তাওয়াফ করেন। অতঃপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বিধবা বা সন্তান-সন্ততিকে এতীম বানানোর ইচ্ছা করে সে যেন আমার পিছু ধাওয়া করে। আমি আল্লাহর পথে হিজরত করছি। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। কেউ পিছু ধাওয়া করার সাহস করেনি। আবু বকর সিদ্দিক রাসূলের নিকট হিজরতের অনুমতি চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, তাড়াহুড়া করো না। আশা করি আল্লাহ তোমার জন্য এক জন সঙ্গী নির্ধারণ করবেন। অধিকাংশ মুসলিম ইতোপূর্বে হিজরত করেছেন। কুরাইশরা প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের উন্নতি ও উজ্জল ভবিষ্যতের ভয় ও আশংকা বোধ করলো। সবাই

পরামর্শ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। আবু জাহল প্রস্তাব পেশ করলো যে প্রত্যেক গোত্রের এক এক জন নির্ভীক যুবককে তরবারী দেওয়া হবে। এরা মুহাম্মাদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এক যোগে আত্রমণ করে হত্যা করবে। ফলে তার রক্ত বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনি হাশেম এর পর সব কবিলার সাথে লড়াই করার হিম্মত করবে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দেন। তিনি আবু বকরের সাথে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। রাতে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন, যাতে লোকেরা মনে করে যে, রাসূল বাড়ীতেই আছেন এবং আলিকেও এ আশ্বাসও দিলেন যে কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ইতোমধ্যে কাফেররা বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। বিছানায় আলিকে দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে, রাসূল বাড়ীতে আছেন এবং হত্যা করার জন্য তাঁর বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো। এ দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে সবার মাথার

উপর বালু ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেন। ফলে তারা আঁচও করতে পারলো না যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন। অত:পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম করে "ছওর" গুহায় লুকিয়ে থাকেন। কুরাইশ যুবকরা ভোর বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অন্যদিকে আলিকে রাসূলের বিছানায় দেখতে পেয়ে হতাশ, বিস্মিত ও ক্ষেপে যায়। তারা আলিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও মারধর করে ও কোনো হদিস বের করতে না পেয়ে চতুর্দিকে লোকজন পাঠালো। তাঁকে জীবিত বা মৃত্যু অবস্থায় ধরে দিতে পারার জন্য ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। লোকজন চারিদিকে হন্যে হয়ে খুজতে লাগলো। এমন কি তারা যদি একটু ঝুকে গুহার ভিতর তাকায়, তাহলে তাদের দেখতে পায়। এমন শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে রাসূলের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, «لا تحزن إن الله معنا» "চিন্তা করো না আল্লাহ

আমাদের সাথে আছেন। অনুসন্ধানকারীরা তাদের সন্ধান আর পেল না।”

গুহায় তারা তিন দিন অবস্থান করে মদিনার পথে যাত্রা শুরু করেন। পথ ছিল সুদীর্ঘ ও দুর্গম। সূর্য ছিল অতীব উত্তপ্ত। দ্বিতীয় দিন বিকেল বেলায় এক তাবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন যেখানে উম্মে মা'বাদ নামে এক মহিলা বাস করতো। রাসূল তাঁর কাছে খাবার ও পানি চাইলে সে কিছুই দিতে পারে নি। কিন্তু একটি স্ত্রী ছাগল এতই দুর্বল ছিল যে ঘাস খেতে যেতে পারেনি। এক ফোটা দুধ তার স্তনে ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্তনের উপর তাঁর হাত মুবারক বুলিয়ে দিয়ে দুধ দোহন করে এক বড় পাত্র ভরে নেন। উম্মে মা‘বাদ এ অলৌকিক ঘটনা দেখে বিস্মিয় ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। সবাই পান করেন এবং ক্ষুধা নিবারণ করেন। অতঃপর আর এক পাত্র ভরে উম্মে মা‘বাদকে দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন।

মদিনাবাসী এদিকে তাঁর শুভাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছিলেন। প্রতিদিন তারা মদিনার বাইরে প্রতীক্ষায় থাকতেন। যে দিন তাঁর আগমন হয় সে দিন সবাই পুলকিত হৃদয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি মদীনার নিকটে কুবায় যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানে চার দিন অবস্থান করেন। তিনি এ সময় কুবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এটাই ইসলামের প্রথম মসজিদ। ৫ম দিন তিনি মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অনেক আনসারী সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিথি হিসাবে বরণ করার চেষ্টা করেন এবং তার উটের লাগাম ধরেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শুকরিয়া আদায় করে বলেন, উট ছেড়ে দাও, সে নির্দেশপ্রাপ্ত। আল্লাহর নির্দেশ যেখানে হল সেখানে গিয়ে উট বসে যায়। তিনি অবতরণ না করতেই উঠে সে অগ্রভাগে কিছু পথ চলে আবার পিছনে এসে প্রথম স্থানে বসে যায়। সেটাই ছিল মসজিদে নববীর স্থান। তিনি আবু আইয়্যুব আনসারীর অতিথি হন। আলি ইবন আবু তালিব নবীর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন। অতঃপর কুবায় রাসূলের সাথে মিলিত হন।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

উট যেখানে বসে গিয়েছিলো জায়গাটি প্রকৃত মালিক থেকে কেনার পর সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণ করেন। এক একজন মুহাজির ও আনসারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় হয়। মদীনার ইয়াহুদিদের সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক ছিল। তারা মুসলিমদের মাঝে বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টির পায়তারা চালাতো। কুরাইশরা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার হুমকিও প্রদর্শন করতো। এ ভাবে বিপদ ও আশংকা মুসলিমদেরকে ভিতর ও বাইরে ঘিরে ছিল। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে সাহাবায়ে কেরাম রাতে ঘুমাবার সময় অস্ত্র রাখতেন।

বদর যুদ্ধ

এমন বিপদজনক ও বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতি আল্লাহ তা'আলা সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের তৎপরতা জানার লক্ষ্যে সামরিক মিশন চালানো আরম্ভ করেন। শত্রুদের বানিজ্যিক কাফেলার পিছু নেওয়া ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে লাগলেন, যাতে তারা মুসলিমদের শক্তির কথা উপলব্ধি করে শান্তি ও সন্ধি প্রক্রিয়ায় এসে ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতায় ও তা বাস্তবায়নে কোনো ধরণের বিঘ্ন না ঘটায়। কতিপয় গোত্রের সাথে মৈত্রি চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। একবার তিনি কুরাইশের এক বানিজ্যিক কাফেলার পথ রুদ্ধ করা কল্পে তিন শত তের জন সাথী নিয়ে বের হন। সাথে ছিল ২টি ঘোড়া ৭০টি উট। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশী কাফেলায় উট ছিলো ১০০০ এবং ৪০ জন লোক। আবু সুফিয়ান মুসলিমদের বের হবার কথা শুনে জরুরী ভিত্তিতে এক লোক পাঠিয়ে মক্কায় খবর দেয় এবং সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য পথ ধরে। ফলে

মুসলিমরা তাদেরকে ধরতে পারেন নি। অন্য দিকে কুরাইশরা এ খবর পেয়ে ১০০০ যোদ্ধা নিয়ে বের হয়ে পড়ে কাফেলার সাহায্যের জন্য। আবু সুফিয়ান কাফেলার নিরাপদে চলে আসার খবর জানিয়ে তাদেরকে মক্কায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আবু জাহল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং যোদ্ধারা বদর নামক স্থান পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখে। কুরাইশের বের হবার কথা জেনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলে সবাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রায় দেন। হিজরী ২য় সনে ১৭ই রমযান শুক্রবার ভোর বেলায় উভয়দল মুখোমুখি হয় এবং তমুল যুদ্ধ চলে। মুসলিমরা বিপুলভাবে জয়লাভ করেন। তাদের মধ্যে ১৪জন শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। ৭০ জন কাফের নিহত এবং ৭০ জন গ্রেফতার হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে নবী কন্যা রুকাইয়্যা মারা যান। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের নির্দেশে তাঁর রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পরিচর্যা ও দেখা-শুনার জন্য মদীনায় থেকে যাওয়ার ফলে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। যুদ্ধের পরে

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল “যুন-নূরাইন”। কারণ, তিনি রাসূলের দু’কন্যা বিয়ে করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্যে উল্লাসিত ও আনন্দিত হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সাথে ছিল যুদ্ধ বন্দী ও মালে গনিমত। যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে কিছু লোককে পণ্যের বিনিময়ে, আবার অনেককে এমনিতে মুক্তি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে কিছু লোকের মুক্তিপণ ছিলো মুসলিমদের ১০জন ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে দেওয়া।

ওহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের পর মুসলিম ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় ওহুদ যুদ্ধ হচ্ছে তন্মধ্যে দ্বিতীয়। এতে মুশরিকরা জয়লাভ করে। কারণ কিছু সংখ্যক মুসলিম রাসূলের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন নি। ফলে সুপরিকল্পিত কলা কৌশলকে ব্যাহত করে। যুদ্ধে

কাফেরদের সংখ্যা ছিল ৩০০০। পক্ষান্তরে মুসলিম ছিলেন ৭০০ জন।

খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ

এ যুদ্ধের পর মদীনার কিছু ইয়াহূদী মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দেয় এবং নিজেদের সমর্থন, সাহায্য সহযোগিতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ফলে কাফিররা ইতবাচক সাড়া দেয়। অতঃপর ইয়াহূদীরা অন্যান্য গোত্রসমুহকে উস্কানি দিলে তারাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। মুশরিকরা প্রত্যেক এলাকা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দেয়। ১০,০০০ যোদ্ধা সমবেত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুপক্ষের তৎপরতার কথা জেনে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সালমান ফারসী মদীনার যে দিকে পাহাড় নেই সে দিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। সব মুসলিম উদ্যম ও প্রেরণা সহকারে পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেন এবং কাজ সত্বর সমাপ্ত হয়। মুশরিকরা এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেও

পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করে কাফেরদের তাবুসমূহ উপড়ে ফেলেন। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই নিজ নিজ শহরে ফিরে যায়।

মক্ক বিজয়

হিজরী ৮ম সনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেন। ১০ই রমযান ১০০০০ সদস্যের বাহিনী নিয়ে মক্কাঅভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কায় যুদ্ধ ছাড়াই প্রবেশ করেন। কুরাইশরা আত্মসমর্পন করে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ তাওয়াফ করে কা'বার অভ্যন্তরে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। অতঃপর ভেতরে রাখা সব মুর্তি চুর্ণ বিচুর্ণ করেন। কা'বা শরীফের দরজায় দাড়িয়ে মসজিদে হারামে কাতারবদ্ধভাবে অপেক্ষারত সমবেত কুরাইশদেরকে বলেন, হে কুরাইশরা! তোমাদের সাথে কি আচরণ করবো বলে মনে করো। তারা বলে ভালো

আচরণ, দয়াবান ভাই, দয়াবান ভাই এর পুত্র। তিনি বলেন, যাও তোমরা সবাই মুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমার উজ্জল ও বৃহত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তারাই সেই লোক যারা তাঁর সাহাবীদের ওপর চালিয়ে ছিল অত্যাচারের স্ট্রীম রোলার, খুন করেছে অনেককে, কষ্ট দিয়েছে স্বয়ং তাঁকে এবং নিজের মাতৃভুমি থেকে বহিস্কার করেছে। মক্কা বিজয়ের পর লোকজন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে সমবেত হয়। হিজরি ১০ম সনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেন। হিজরতের পর এটা তাঁর একমাত্র হজ ছিল। তাঁর সাথে এক লাখ লোক হজ করেন। হজ পালন শেষে তিনি মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু

প্রায় আড়াই মাস পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। দৈনন্দিন রোগ বেড়ে যায়। তীব্রভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে ইমামতি করতে অক্ষম হয়ে পড়লে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইমামতি করতে বলেন। হিজরি ১১ সনে ১২ই

রবিউল আওয়াল সোমবার ৬৩ বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন। এ খবর শুনে সাহাবায়ে কেরাম প্রায় জ্ঞান ও স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ খবর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এমন সময় আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ভাষণে লোকজনকে শান্ত করেন। তিনি বলেন, রাসূল একজন মানুষ ছিলেন। যিনি মারা যান। তিনি রাসূল একজন মানুষ ছিলেন। যিনি মারা যান যেমন অন্যান্য মানুষ মারা যায়। মানুষ শান্ত হয়ে যায়। রাসূলের গোসল দেওয়া, কাফন পরানো ও দাফন করা সম্পন্ন হলো। অতঃপর মুসলিমরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজেদের খলিফা নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে প্রথম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর ও পরে তের বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদিনায় অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

তাঁর চরিত্র

তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। আলী ইবন আবূ তালিব বলেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হতো, এক দল অন্য দলের মুখোমুখি যুদ্ধ করতো, আমরা রাসূলকে ঢাল হিসাবে রাখতাম। তিনি সর্বাপেক্ষা দানবীর ছিলেন। কখনো কোনো জিনিস চাওয়া হলে তিনি না করেন নি। তিনি সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন। নিজের জন্য কোনো প্রতিশোধ নেন নি। নিজের স্বার্থের জন্য কখনো রাগান্বিত হন নি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুম- বিধান লংঘন করা হলে আল্লাহর নিমিত্তেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। অধিকারের ব্যাপারে তাঁর নিকটে আত্মীয় অনাত্মীয়, দুর্বল, সবল সমান ছিলো। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তাকওয়া ছাড়া আল্লাহর কাছে কেউ কারো চাইতে শ্রেয় নয়। সব মানুষ সমান ও সমকক্ষ। পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে ছেড়ে দিতো, আর কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে শাস্তি দিতো। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ যদি চুরি করে, তবে তার হাত কর্তন করবো। কখনো

কোনো খাবারের দোষ বর্ণনা করেন নি। রুচি সম্মত হলে আহার করতেন। অন্যথায় বর্জন করতেন। কোনো কোনো সময় এক মাস দু'মাস পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে আগুন প্রজ্জলিত করা হতো না। তিনি ও তাঁর পরিবার শুধু খেজুর ও পানি আহার করেছেন। ক্ষুধার তীব্র জ্বালা প্রশমিত করার জন্য মাঝে মাঝে উদর মুবারকে প্রস্তর বেধে রাখতেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন। তিনি নিজের জুতা নিজেই সিলাই করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং গৃহ কর্মে তাঁর পরিবারবর্গের সহযোগিতা করতেন। তিনি অতি নম্র ছিলেন। ধনী গরীব, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত সবার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। ভালোবাসতেন গরীব মিসকীনকে প্রচুর। জানাযায় হাযির হতেন। পীড়িত লোকদের দেখতে যেতেন। কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে দারিদ্রের জন্য ঘৃণা করতেন না। কোনো রাজা বা শাসককে তাঁর রাজত্ব ও যশ ঐশর্যের কারণে ভয় করতেন না। ঘোড়া, উট, গাধা, ও খচ্চরের উপর আরোহন করতেন। সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ছিলেন। সব চাইতে বেশি স্নিগ্ধ হাসতেন। অথচ দুঃখ বিপদ অনবরত

আসতে থাকতো। সুগন্ধি ভালোবাসতেন। দূর্গন্ধ ঘৃণা করতেন। আল্লাহ তা‘আলা চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সুন্দর কর্মের অনুপম সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এমন জ্ঞান দান করেছিলেন যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কাউকে দান করা হয় নি।

তিনি ছিলেন নিরক্ষর। জানতেন না লেখা-পড়া। মানুষের মধ্যে কেউ তাঁর শিক্ষক ছিলো না। আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আসেন মহানগ্রন্থ আল-কুরআন যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ﴾ [الاسراء: ٨٨]

“বলুন, যদি মানুষ ও জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না।” [সূরা ইসরা, আয়াত: ৮৮]

রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরক্ষর হওয়াটাই মিথ্যা অপবাদকারীদের সব অহেতুক প্রলাপের অকাট্য,

অপ্রতিরোধ্য ও অখণ্ডনীয় উত্তর। যাতে একথা বলতে না পারে যে তিনি স্বহস্তে লিখেছেন বা অন্যের কাছে শিখেছেন বা অন্য সুত্র থেকে পাঠ করে সংগ্রহ করেছেন।

তাঁর কতিপয় মু'জিযা

তাঁর সব চেয়ে বড় মু'জিযা কুরআন, যা আরবি সাহিত্যের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে এবং সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে যে, কুরআনের অনুরুপ গ্রন্থ বা ১০টি সূরা অথবা ১টি সূরা রচনা করে আনো। মুশরিকরা নিজেদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছে। মুশরিকরা একবার তাঁকে একটি নিদর্শন দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াকে দেখান। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। অনেক বার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে। অতঃপর যথাক্রমে আবু বকর, উমার ও উসমানের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছে। খাবার আহার করাকালীন তাঁর কাছে তাসবীহ পাঠ করতো এবং এর ধ্বনী সাহাবায়ে কেরাম শুনতে

পেতেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির রাত সমূহে পাথর ও গাছপালা সালাম করেছে। এক ইয়াহূদী নারী রাসূলকে বিষপানে হত্যা করার জন্য ছাগলের এক পা খেতে দেয় যা বিষ মাখা ছিলো। সে পা রাসূলের সাথে কথা বলে। একবার এক বেদুইন তাঁকে একটি নিদর্শন দেখাতে বলে। তিনি একটি গাছকে নির্দেশ দিলে রাসূলের কাছে আসে। আবার নির্দেশ দিলে যথা স্থানে চলে যায়। এক দুধ বিহীন ছাগলের স্তনে হাত মুবারাক স্পর্শ করায় দুগ্ধ আসে। তিনি তা দোহন করে নিজেও পান করেন এবং আবু বকরকেও পান করতে দেন। আলী ইবন আবু তালিবের ব্যথিত চোখে তিনি থুথু দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যায়। এক সাহাবী পায়ের আঘাতে আহত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মুছিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে যায়। আনাস ইবন মালিকের জন্য সুদীর্ঘায়ূ, স্বচ্ছলতা এবং সন্তান-সন্ততিতে বরকতের দো'আ করেন। ফলে আল্লাহ তাকে এত বরকত দান করেন যে, তাঁর স্ত্রীসমূহের ঔরসে ১২০ জন সন্তান জন্ম নেয়, তাঁর খেজুর গাছে বছরে দু'বার ফল ধরত, অথচ এ

কথা সুবিদিত যে খেজুর গাছে বছরে এক বারই ফল আসে। আর তিনি ১২০ বছর বয়স পেয়েছিলেন। এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে ছিলেন, এমতাবস্থায় এক লোক এসে অনাবৃষ্টি ও খরা অবসানের জন্য দো‘আর আরয করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আ করলেন। আকাশে কোনো মেঘ ছিল না। হঠাৎ পর্বত সম মেঘ ছেয়ে গেল। মুষল ধারা বৃষ্টি হলো পরবর্তী জুমা পর্যন্ত। একই ব্যাক্তি অতিবৃষ্টির অবসান হওয়ার জন্য দো‘আর আবেদন করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আ করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ সূর্যের তাপে বের হয়ে গেলো। একটি ছাগল ও প্রায় তিন কিলো গ্রাম গম দিয়ে এক হাজার পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে পেট ভরে খাওয়ান। সাবাই খাওয়ার পরেও খাবার সামান্যও কম হয়নি। অনুরূপভাবে অল্প খেজুর দিয়ে পরিখা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের খাওয়ান যে খেজুর বাশির ইবন সা‘দের কন্যা তাঁর পিতা ও মামার জন্য এনেছিলো এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বল্প খাদ্য দ্বারা পরিখা যুদ্ধের

মুজাহিদগণকে পেট ভরে খাওয়ান। তিনি একশ জন কুরাইশ ব্যক্তি যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছিলো, এর মুখের দিকে মাটি ছিটিয়ে দিলে কেউ তাকে দেখতে সক্ষম হয় নি। তিনি তাদের নাকের ডগায় চলে গেলেন। সুরাকা ইবন মালেক তাঁকে হত্যা করার জন্যে পিছু ধাওয়া করে আর রাসূল দো‘আ করলে তার পা যমীনে ধসে যায়।

নবী জীবনী: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর ওপর সংক্ষিপ্ত একটি গ্রন্থ। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত অতি সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি পাঠকমহল এতে উপকৃত হবেন।